BHARATI INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH & DEVELOPMENT (BIJMRD)

(Open Access Peer-Reviewed International Journal)

DOI Link : https://doi.org/10.70798/Bijmrd/04100013

Available Online: www.bijmrd.com | BIJMRD Volume: 4 | Issue: 10 | October 2026 | e-ISSN: 2584-1890

অজিতকুমার ও রবীন্দ্রনাথ : একটি সম্পর্কের বৃত্ত

Dr. Mithu Jana

Assistant Professor, Department of Bengali, Hijli College, Kharagpur, Paschim Medinipur, West Bengal, India.
Email: mithujana2017@gmail.com

সারসংক্ষেপ (Abstract)

বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির ইতিহাসে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে অজিতকুমার চক্রবর্তীর সম্পর্ক একটি তাৎপর্যপূর্ণ অধ্যায়। এই সম্পর্কের পরিসরে যেমন ছিল গভীর শ্রদ্ধা, স্নেহ, বিশ্বাস ও আদর্শগত নৈকট্য, তেমনই সময়ের পরিবর্তনে দেখা দিয়েছিল মানসিক দ্বন্দ্ব, অভিমান এবং মতপার্থক্য। অজিতকুমার চক্রবর্তী ছিলেন রবীন্দ্রনাথের একান্ত স্নেহধন্য, মেধাবী সাহিত্যিক, শিক্ষক, অনুবাদক ও সমালোচক। শান্তিনিকেতনের শিক্ষাব্যবস্থা ও আশ্রমজীবনের বিকাশে তাঁর ভূমিকা ছিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যভাবনা, জীবনদর্শন এবং সৃষ্টিশীলতার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য উপলব্ধি ও বিশ্লেষণে অজিতকুমারের অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ ও অজিতকুমারের সম্পর্কের বিভিন্ন পর্যায়কে ঐতিহাসিক, সাহিত্যিক ও মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করা হয়েছে। বিশেষত তাঁদের পারস্পরিক পত্রালাপ, সাহিত্যচর্চা, শান্তিনিকেতনের শিক্ষাদর্শ, অনুবাদকর্ম এবং ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার আলোকে এই সম্পর্কের অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্য অনুসন্ধান করা হয়েছে। অজিতকুমারের 'রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থ এবং রবীন্দ্রসাহিত্য সম্পর্কে তাঁর সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি কবির সাহিত্যিক সত্তা অনুধাবনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অন্যদিকে, রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য ও জীবনদর্শনের আন্তর্জাতিক পরিচিতি বিস্তারের ক্ষেত্রেও অজিতকুমারের অনুবাদ ও প্রচারমূলক উদ্যোগ বিশেষ তাৎপর্য বহন করে।

তবে তাঁদের সম্পর্ক কেবল গুরু-শিষ্য বা কবি-অনুরাগীর সম্পর্কের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না; বরং তা ছিল পারস্পরিক প্রত্যাশা, আত্মিক সংযোগ, আদর্শের সংঘাত এবং মানবিক অনুভূতির এক জটিল সমন্বয়। সময়ের ব্যবধানে সম্পর্কের মধ্যে যে দূরত্ব ও অভিমানের সৃষ্টি হয়েছিল, তা সত্ত্বেও পারস্পরিক স্নেহের বন্ধন সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়নি। অতএব, এই গবেষণার মূল উদ্দেশ্য হলো রবীন্দ্রনাথ ও অজিতকুমারের সম্পর্কের বহুমাত্রিকতা উন্মোচন এবং বাংলা সাহিত্য-ইতিহাসে অজিতকুমারের স্বতন্ত্র অবদানকে যথাযথভাবে মূল্যায়ন করা।

Keywords: *অজিতকুমার চক্রবর্তী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গুরু-শিষ্য সম্পর্ক, শান্তিনিকেতন, পত্রসাহিত্য, রবীন্দ্র-সমালোচনা।*

রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম বিদ্যালয়ের শিক্ষক সতীশচন্দ্র রায়ের (১৮৮২-১৯০৪) মৃত্যুর পর অজিতকুমার চক্রবর্তী (১৮৮৬-১৯১৮)নতুন শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন। সতীশচন্দ্র ছিলেন অজিতকুমারের অভিন্নহৃদয় বন্ধু। অজিতকুমার ১৯০৪-এ পাশ কোর্সে বি.এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে এই কাজে যোগ দিলেও তিনি বন্ধু সতীশ রায়ের সময়েই বিদ্যালয়ের কাজে আত্মনিয়োগ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু মায়ের নির্দেশে বি.এ. পাশ করা পর্যন্ত তাঁকে অপেক্ষা করতে হয়। এ প্রসঙ্গে প্রশান্তকুমার পাল লেখেন--

‘সতীশচন্দ্র রায়ের মৃত্যুতে এবং নরেনবাবু (নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য) চলিয়া যাওয়ায় তাঁহাদের স্থানে আর একটি শিক্ষককে লওয়া হইল। ইঁহার নাম অজিতকুমার চক্রবর্তী।’[১]

একদিন সতীশচন্দ্র রায়কে কবির সঙ্গে অজিতকুমার পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন এবং প্রথম সাক্ষাতেই রবীন্দ্রনাথ দু’জনকেই ভালোবেসে ফেলেছিলেন—

‘-------দুটি তরুণ যুবক, তাঁদের বালক বললেই হয়, এসে পড়লেন আমার কাছে। অজিতকুমার চক্রবর্তী তাঁর বন্ধু কবি সতীশচন্দ্র রায়কে নিয়ে এলেন আমাদের জোড়াসাঁকোর বাড়িতে আমার একতলার বসবার ঘরে। সতীশের বয়স তখন উনিশ, বি.এ. পরীক্ষা তাঁর আসন্ন। তার পূর্বে তাঁর একটি কবিতার খাতা অজিত আমাকে পড়বার জন্যে দিয়েছিলেন। পাতায় পাতায় খোলসা করেই জানাতে হয়েছে আমার মত।------আমার মতের যে অংশ ছিল অপ্রিয়, অজিত তাতে অসহিষ্ণু হয়েছিলেন, কিন্তু সৌম্যমূর্তি সতীশ স্বীকার করে নিয়েছিলেন প্রসন্নভাবে।’[২]

যাইহোক, বন্ধু সতীশচন্দ্র শান্তিনিকেতন আশ্রমে যোগ দেবার পর অজিতকুমার তাঁর সঙ্গ লাভের জন্য মাঝে-মাঝেই সেখানে গিয়ে থাকতেন। সেইসময় আলমোড়া প্রবাসী কবিকে অজিতকুমার শান্তিনিকেতন থেকে চিঠি লিখলে প্রত্যুত্তরে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে আশ্রমের কাজে উৎসাহিত করে লেখেন—

‘তোমার চিঠি পাইয়া বড় খুশি হইলাম, তোমরা যে দুটি মধুকরের মত শান্তিনিকেতনের নীলাকাশ শতদলের প্রচ্ছন্ন মধুটুকু স্তব্ধ হইয়া আনন্দ উপভোগ করিতেছ ইহা আমার পক্ষে সুসংবাদ। তোমরা যেখানে যাত্রা করিতেছ তাহার পথ কাহাকেও দেখাইয়া দেওয়া চলে না..... তোমরা পুঁথিগত অভ্যস্ত বিদ্যার পথ, সহস্রের পথ, সমালোচকের পথ ছাড়িয়া নিজের অন্তরতম ধ্রুব আদর্শের এক মহাপথ ধরিয়া সার্থকতায় উত্তীর্ণ হইবে এই আমি আশা করিতেছি। সতীশের সম্মুখে একটি সার্থক পরিণাম প্রতীক্ষা করিয়া আছে ইহা আমি বিশ্বাস করি—তুমিও তাহার সঙ্গী হইবে এই আমার কামনা।’[৩]

কিন্তু হঠাৎ মাত্র ২২ বছরে বসন্ত রোগে বন্ধু সতীশচন্দ্রের মৃত্যু ঘটলে (১লা ফেব্রুয়ারী, ১৯০৪) অজিতকুমার মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হন এবং সেই শোকাবহ পরিস্থিতিতেও বি.এ. পরীক্ষা দিয়ে পাশ করেন। যদিও শরীর ও মনে তিনি তখনও বন্ধু বিয়োগে শোকগ্রস্ত। সেইসময় আরেক বন্ধু নিশিকান্ত সেন তাঁকে খরচপত্র দিয়ে বর্মায় নিয়ে যান এবং সেখান থেকে ফিরেই তিনি শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্যাশ্রমে কাজে যুক্ত হন। মাত্র সতেরো টাকা বেতনে ব্রহ্মচর্যাশ্রমে যোগ দিয়ে তিনি বিদ্যালয়ের দুরূহ কাজে নিজেকে নিবিষ্ট করেন। রবীন্দ্রনাথও তাঁকে বারবার উৎসাহিত করেছেন—কখনও দূরে থেকেও অজিতকুমারকে নিজের আশ্রম ভাবনার শরিক করে তুলতে চেয়েছেন। আশ্রমের ভা্লো-মন্দ আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে নিবিড়ভাবে তাঁকে যুক্ত করতে চেয়েছেন। আশ্রমে প্রবল জ্বরে এক ছাত্রের মৃত্যুতে (১০ ভাদ্র, ১৩১১)আশ্রমিকদের সান্ত্বনা দিয়ে কবি গিরিডি থেকে এক পত্রে অভিভাবকদের দিক থেকে আমাদের সমস্ত লক্ষ্য ফিরিয়ে এনে বিদ্যালয়ের অন্তর্গত আদর্শের দিকেই আমাদের লক্ষ্য স্থির রাখতে হবে বলে অজিতকুমারকেই আশ্বস্ত করেছেন ও ভরসা রেখেছেন।

বিদ্যালয়ে ইংরেজী, বাংলা, ভূগোল পড়ানো ছাড়াও বহুমুখী প্রতিভার অজিতকুমার ছিলেন সঙ্গীতেরও শিক্ষক। কিন্তু তাঁরও ছিল অন্তরের দ্বন্দ্ব। ফলতঃ একদিন যে আদর্শ ও ত্যাগের মনোভাব নিয়ে তিনি বিদ্যালয়ের কাজে যোগ দিয়েছিলেন—সাংসারিক ও অর্থনৈতিক কারণে সেখান থেকে তাঁর বিচ্যুতি ঘটলে রবীন্দ্রনাথ তাতে ক্ষুণ্ণ হয়ে লেখেন—

‘..... তুমি বিদ্যালয়ের জন্য যে ত্যাগ কষ্ট স্বীকার করছ সেটা তোমার পরিবারের পক্ষে অতিরিক্ত হওয়াতে অশান্তির কারণ হচ্ছে।.....যদি এমন হয় এর মধ্যে স্বাধীনতার কোনো বিঘ্ন থাকে, অর্থাৎ যদি আমার সঙ্গে তোমার ব্যক্তিগত কোনো শ্রদ্ধা বা অনুরাগ বা বাধ্যবাধকতার সম্বন্ধবশতঃ অথবা ত্যাগ স্বীকারের একটা স্পর্ধাবশতই তুমি কষ্ট স্বীকার করছ তাহলে এ সম্বন্ধ ছেদন করা উচিত সেকথা তোমাকে বলাইবাহুল্য।’[৪]

আসলে বিদ্যালয় থেকে প্রাপ্ত সামান্য টাকায় দু’ভাই সহ বিধবা মা’য়ের ভরণ-পোষণ চালানো অজিতকুমারের পক্ষে ছিল বেশ কষ্টকর। তাঁর মা’ও চাইতেন অজিত অন্য কোথাও কাজ করুক। রবীন্দ্রনাথ তা জানতেন এবং সেজন্যই বেতন বাড়াতে চাইলেও সামর্থে কুলোয়নি—একথা অজিতকুমারকে পত্রে জানিয়েওছিলেন। কখনও কখনও তাঁর দু’ভাইকেই অবৈতনিক ব্রহ্মচর্যাশ্রমে

পড়ার বন্দোবস্ত করেছেন, কখনও অজিতকুমারকে আইন পরীক্ষা দিয়ে ওকালতি করার পরামর্শ দিয়েছেন। কখনও মা সুশীলা দেবীকে শিশুবিভাগের দায়িত্ব দিয়ে আশ্রমে রাখতে চেয়েছেন। যদিও শেষ পর্যন্ত সুশীলাদেবীর কাজে তিনি সন্তুষ্ট থাকতে পারেননি। তাই সুশীলাদেবীও আশ্রমের কাজে যুক্ত থাকতে চাননি। কিন্তু তাইবলে অজিতকুমারের প্রতি তাঁর স্নেহের অবধি ছিল না। ১৯০৯ এর গ্রীষ্মের ছুটিতে অজিতকুমার দার্জিলিং বেড়াতে গিয়ে পেটের অসুখে পড়লে কবি তাঁকে অভিভাবকের মত উপদেশাদিসহ পত্রে লেখেন—

'শোনা গেল তোমার পেটের অসুখ করেছে। পাহাড়ে পেটের অসুখ জিনিসটা নাছোড়বান্দা। তার হাত থেকে নিষ্কৃতির চেষ্টা কোরো। একে তোমার পেটের দুর্ব্বলতা আছে।তারপরে যদি পার্বত্য শত্রুটিও পাকযন্ত্র দখল করে বসে, তাহলে দুঃখ পাবে.....গায়ে গরম কাপড় রাখা দার্জিলিঙের মত জায়গায় একটা ধর্মনৈতিক কর্তব্য একথা মনে রেখো। বাঙালীর পেট পাহাড়ের Cold Reception পছন্দ করে না।'[৫]

এমনকি অজিতকুমারের পরিবারের জন্য রবীন্দ্রনাথের শুভ চিন্তারও অন্ত ছিল না—অজিতকুমারের ভাই সুজিতকুমার এফ.এ. পরীক্ষায় পাশ করলে তাঁকে Technical Institute-এ ভর্তির পরামর্শ পর্যন্ত তিনি দেন।অর্থাৎ কবির সঙ্গে অজিতকুমারের পারিবারিক সম্পর্কটিও অচিরেই গড়ে উঠেছিল।

অধ্যাপনা ছাড়াও আশ্রমে নানা নান্দনিক ক্রিয়াকর্মেও অজিতকুমার যুক্ত থাকতেন—রবীন্দ্রনাথ তাতে ভীষণ খুশী হতেন এবং তাঁকে বারবার উৎসাহ দিয়েছেন। ৮ আশ্বিন ১৩১৫ তে শান্তিনিকেতনের তৎকালীন নাট্যঘরে 'শারদোৎসব'-এ ঠাকুরদার ভূমিকায় গান-অভিনয়ে প্রতিভার স্বাক্ষর রাখেন। কখনও অজিতকুমার রবীন্দ্র-নাটকের মহড়াও পরিচালনা করেছেন। 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটকে ধনঞ্জয় বৈরাগীর ভূমিকায় সুন্দর অভিনয়ে প্রশংসিত হন এবং পরবর্তীকালে তিনি বিলেত প্রবাসী হলে রবীন্দ্রনাথ চিঠিতে তাঁকে জানাতে দ্বিধা করেননি যে, আর একবার 'প্রায়শ্চিত্ত' অভিনয়ে বৈরাগীর পালাটা দেখে সকলেই বিশেষ করে অজিতকুমারের অনুপস্থিতি অনুভব করেছিলেন। তাছাড়াও রবীন্দ্রনাথ কখনও কখনও গান রচনা করে আশ্রম বালকদের শেখানোর জন্য অজিতকুমারের ওপরই ভরসা করেছেন। কবির লেখার কাজের সহায়কও ছিলেন অজিতকুমার। 'ইংরেজী সোপান'-এর সংস্কারের দায়িত্ব অজিতকুমারকেই দিয়েছিলেন কবি। 'প্রবাসী'র সংকলন ও সমালোচনা বিভাগে নিয়মিত লেখার ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে উৎসাহিত করেছেন বারবার। দু'জনের মধ্যে সম্পর্কটি এইসময় বেশ প্রগাঢ় হয়ে ওঠে।

কিন্তু এইসময়েই রবীন্দ্রনাথের আহ্বানে বালবিধবা লাবণ্যলেখা আশ্রমে শিশুবিভাগের কাজে যোগ দেন। রবীন্দ্রনাথ প্রথম পরিচয়েই (২৪/১০/১৯০৮) লাবণ্যলেখার বিদ্যাবত্তায় সন্তুষ্ট হয়ে অজিতকুমারকেই ৩০ অক্টোবর চিঠিতে জানান যে--আর একটি মেয়েও বাংলা পড়াবার ভার নিতে পারবে—সে বাংলা বেশ ভালই জানে। কিন্তু অচিরেই বিদ্যালয়ের কাজ করতে করতেই এই লাবণ্যলেখার সঙ্গে অজিতকুমারের পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা তৈরি হলে তা নিয়ে আশ্রমে বিশেষ চাঞ্চল্য সৃষ্টি হলে রবীন্দ্রনাথও বিব্রত হয়েছেন। তাই কৌতুক করে ক্ষিতিমোহন সেনকে এ প্রসঙ্গে লেখেন যে—

'এখানকার একটি খবর হয়তো কোনো দক্ষিণ বায়ুযোগে পূর্বেই আপনার কানে পৌঁছিয়া থাকিবে। সেই খবরের সঙ্গে সঙ্গে এখানকার আম্রমুকুলের গন্ধ এবং ফাগুনের কোকিল কূজনেরও বোধহয় কিছু কিছু আভাস পাইয়া থাকিবেন। এই সংবাদে এই পুরাতন তত্ত্বটি বোধহয় আবার নূতন করিয়া স্মরণ করিবেন যে, অজিতকেও জিতিতে পারে এমন দেবতা জগতে আছেন এবং তিনি সশস্ত্রে আশ্রমে প্রবেশ করিতে সঙ্কোচ করেন না .....এবারে আমাদের আশ্রমের অধ্যাপকটি লাবণ্যের নিকট পরাভব স্বীকার করিয়াছেন।'[৬]

কৌতুকের সুরে কবি একথা বললেও এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রবীন্দ্রনাথ অস্বস্তির মধ্যে পড়েছেন—এমনকি এই পরিস্থিতিতে তাঁদের উভয়ের সহজ সম্পর্কটি ভাঙাগড়ার মধ্য দিয়ে ক্রমে জটিল থেকে জটিলতর হয়ে উঠেছে।

আসলে অজিতকুমারের মায়েরও এই বিয়েতে অসম্মতি ছিল। অজিতকুমারের মা মনে করতেন, এই বিয়ের জন্য রবীন্দ্রনাথই দায়ী। আবার অজিতকুমারের অভিযোগ ছিল যে, লাবণ্যলেখার বাবা অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ এই বিয়ের ব্যাপারে নিরুৎসাহী। স্বভাবতই কবি উভয়সঙ্কটে পড়েছেন। সর্বোপরি এই পরিস্থিতির জন্য তিনি যে কোনোভাবেই দায়ী নন—সেকথা জানিয়ে অজিতকুমারকে দীর্ঘ পত্র লিখেছেন এবং বিব্রত-ক্ষুব্ধ চিত্তে তাঁর মা'কেও তা দেখাতে বলেছেন—

'.....তোমার মা'কে এই চিঠি দেখাবে। তোমার জীবনের কোনো ব্যাপারে তুমি আঘাত পেলে তিনি আমাকে দায়ী করবেন। অন্তরের দিক থেকে দায় আছে—কেননা তুমি আমার খুব কাছে এসে পড়েছ—কিন্তু যে বিশেষ ঘটনায় সংসারের দিক থেকে আমার কোনো সত্য দায়িত্ব নেই সেখানে আমাকে অপরাধী করা ও সেই অমূলক অপরাধের কথা কারো কাছে আলোচনা তাঁর পক্ষে ন্যায় সঙ্গত হবে না.....আশঙ্কা হচ্ছে আমার পত্রে হয়তো তোমার মনে আঘাত লাগবে। কিন্তু সেই আঘাতের ক্ষোভ দূর করে শান্তভাবেই তুমি সত্যকে গ্রহণ করবে—একান্ত মনে এই আশা করছি।'[৭]

শুধু তাই নয়—অসবর্ণ বিবাহে শান্তিনিকেতনের যথেষ্ট আপত্তিকেও উপেক্ষা করতে পারেননি লাবণ্যলেখা ও অজিতকুমার। তবু শত বাধা উপেক্ষা করে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথেরই ব্যবস্থাপনায় ৩০ বৈশাখ, ১৩১৭তে বিবাহ-উৎসব অনুষ্ঠিত হল কলকাতায় ৬৩ নং আমহার্স্ট স্ট্রিটে—রবীন্দ্রনাথই কন্যা সম্প্রদান করেন। বিবাহের নিমন্ত্রণ পত্রের অভিনব পরিকল্পনাটি করেছিলেন রথীন্দ্রনাথ। যাইহোক, এই বিবাহ সম্পর্কে অজিতকুমারের মা সুশীলা দেবীর পুত্রের উপর অধিকারবোধজাত অনমনীয় মনোভাব এবং অজিতকুমারের স্পর্শকাতরতা ও আত্মাভিমান, সেইসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের শালীনতাবোধে আঘাত-এমনকি ঘরে বাইরের বেশকিছু মানুষের হাসি কৌতুক আলোচনা যে বিষয়টাকে এত জটিলতা দিয়েছিল, অচিরেই তার অবসান ঘটে। আমাদের মনে হয় অজিতকুমার যদি লাবণ্যলেখার সঙ্গে তাঁর ভালোবাসার সম্পর্কের কথাটা প্রথমেই রবীন্দ্রনাথকে জানাতেন, এবং তাঁর উপদেশ নিয়ে বিবাহের প্রস্তুতি নিতেন তাহলে হয়তো এতখানি জটিলতার সৃষ্টি হত না।আর হয়ত বা কবি ও অজিতকুমারের মধ্যেকার সম্পর্কের ভাঙনটিকেও রোধ করা যেত।

তবে বিয়ের চারমাস পরে ৩ সেপ্টেম্বর, ১৯১০ তাং. অজিতকুমার ম্যাঞ্চেস্টার বৃত্তি নিয়ে বিলেতে যান—রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং এ বিষয়ে তদারকি করেন। অক্সফোর্ড বৃত্তির জন্য এখানকার অন্যতম নির্বাচক ডা. পি.কে. রায়কে (প্রসন্নকুমার রায়) রবীন্দ্রনাথ একটি দীর্ঘ সুপারিশপত্র পর্যন্ত লিখে দিয়েছেন—

'সবিনয় নমস্কারপূর্বক নিবেদন—যিনি এই পত্র লইয়া আপনার কাছে যাইতেছেন তিনি আমার বিশেষ পরিচিত স্নেহভাজন—ইঁহার নাম শ্রীযুক্ত অজিতকুমার চক্রবর্তী। ইঁহার পিতা শ্রীচরণবাবুকে নিঃসন্দেহে আপনি জানিতেন। অজিত বি.এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। ইঁহার দর্শনবিষয়ক পত্রোত্তরে পরীক্ষকগণ বিশেষভাবে বিস্ময়বোধ করিয়াছিলেন।

সেবার মোহিতবাবু চারিত্রনীতি সম্বন্ধে পরীক্ষা কর্তা ছিলেন, তিনি অজিতের কাগজ দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছিলেন ও ইঁহাকে বোলপুর বিদ্যালয়ের কাজে নিযুক্ত করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন। তাঁহার অনুরোধ বশতই আমি অজিতকে আমার বিদ্যালয়ে গ্রহণ করি। সেই অবধি ৫/৬ বৎসরকাল ইঁহার সহিত আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয় চলিতেছে। একথা আমি নিঃসংশয়ে বলিতে পারি বোধশক্তি, ধারণাশক্তি, কল্পনাবৃত্তি এবং প্রকাশ ক্ষমতায় ইঁহার অসামান্যতা আছে। যথোচিত সুযোগ পাইলে ইনি যে প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারিবেন সে বিষয়ে আমার সন্দেহ নাই।

শিক্ষকতায় ইনি সুদক্ষ, বক্তৃতা করিবার ক্ষমতাও ইহার সুন্দর আছে এবং প্রবন্ধ রচনায় ইনি স্বাধীন চিন্তাশীলতার পরিচয় দিয়া থাকেন।

ম্যাঞ্চেষ্টারে তত্ত্ববিদ্যার শিক্ষা দিবার জন্য যে বৃত্তি নির্দিষ্ট আছে, সেই বৃত্তি পাইবার জন্য ইনি যেরূপ উপযুক্ত এমন দ্বিতীয় আর কাহাকেও আমি জানি না।

ইতিপূর্বে সমিতির নিকট আমি কাহারো জন্য অনুরোধ করি নাই—সেই দায়িত্ব গ্রহণ করিবার উপযুক্ত কাহাকেও আমি জানিতাম না—কিন্তু স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া অজিতের জন্য আপনাদের নিকট অনুরোধ প্রেরণ করা কর্তব্য বলিয়াই মনে করিতেছি।

অজিত যদি বৃত্তি লাভ করিয়া তাঁহার শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা সম্পূর্ণ করিয়া আসিতে পারেন তবে তাঁহার দ্বারা আমরা যে বিশেষ উপকার আশা করিতে পারি, সে সম্বন্ধে আমার মনে দ্বিধামাত্র নাই।

শিক্ষা দান, বক্তৃতা ও প্রবন্ধ রচনার দ্বারা ধর্মবোধের উদ্বোধনই ইনি জীবনের ব্রতস্বরূপ গ্রহণ করিয়াছেন। সে কাজে যেমন তাঁহার আগ্রহ তেমনি তাঁহার ক্ষমতা রহিয়াছে—বস্তুত একত্রে এরূপ সমাবেশ দুর্লভ, আমার বিশ্বাস ম্যাঞ্চেষ্টার বৃত্তির জন্য এরূপ যোগ্য পাত্র পাওয়া কঠিন, এবং ইনি সেখানকার কলেজে গিয়া সেই বৃত্তির সম্মান রক্ষা করিতে পারিবেন।

এ সম্বন্ধে আপনি যদি ইহার আনুকূল্য করেন তবে তাহা কদাচ ব্যর্থ হইবে না।.....১৫ই বৈশাখ, ১৩১৭

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।[৮]

তাছাড়াও অত্যন্ত স্নেহের প্রাবল্যে রবীন্দ্রনাথ ব্যক্তিগতভাবে তাঁকে অর্থ সাহায্যও করেছিলেন। লাবণ্যলেখাকে ঢাকায় তাঁর দাদা বিভুচরণের কাছে অজিতকুমার রেখে যান। নিয়মিত পথের বর্ণনা দিয়ে পত্রে তিনিও কবির উপর নির্ভরশীলতায় স্ত্রীকে লেখেন—

'.....তোমার কোনো অসুবিধা হচ্ছে না তো? তোমার যখন যা হবে গুরুদেবকে জানিয়ো। তিনি ছাড়া আমাদের অন্য গুরু কেউ নেই।'[৯]

অজিতকুমার লন্ডনে পৌঁছান ২৫ সেপ্টেম্বর, ১৯১০—রবীন্দ্রনাথ সেই সংবাদে আশ্বস্ত হয়ে লিখেছেন—

'আজ তোমার পথিমধ্যের চিঠিখানি পেয়েছি। কিন্তু তার পূর্বেই তারযোগে তোমার পৌঁছানোর সংবাদ জানা গিয়েছে। এতদিনে ইংলন্ডের হাওয়াটা তোমার নিশ্চয়ই সুপরিচিত হয়ে গিয়েছে। তাছাড়া তোমাদের কলেজ অধ্যয়নের পালাও শুরু হয়ে গিয়েছে।'[১০]

এদিকে লন্ডনের 'The Christian life' নামক পত্রিকায় ১লা অক্টোবর, ১৯১০-এ অজিতকুমারের সাক্ষাৎকারভিত্তিক যে প্রতিবেদন প্রকাশিত হয় সেটি ইংলন্ডের পত্রিকায় প্রকাশিত সর্বপ্রথম রবীন্দ্রনাথ ও আশ্রমবিষয়ক সংবাদ। পত্রিকার সম্পাদক বোলপুর সম্বন্ধে একটু কিছু লিখতে বলায় অজিতকুমার 'শান্তিনিকেতন আশ্রম, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ এবং রবীন্দ্রনাথ' শিরোনামে এই লেখাটি পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু পত্রিকা কর্তৃপক্ষ সেই শিরোনামের বদলে লেখেন—

'NEW B. & F.U.A. INDIAN STUDENT INTERVIEW WITH MR. A.KUMAR CHAKRAVERTI'

লণ্ডন থেকে অজিতকুমার ৬ অক্টোবর অক্সফোর্ড গিয়েছেন—কিন্তু এই ক'দিনেই শরীর অসুস্থ হওয়ায় পাঠ অসমাপ্ত রেখেই দেশে ফিরে আসার কথা ভেবেছেন। অন্যদিকে পুনরায় মত বদল করে যে কাজের জন্য বৃত্তি নিয়ে ওদেশে গিয়েছেন—সেইকাজটি একবছরের মধ্যে শেষ করে অক্সফোর্ডে দুবছর থেকে বি.এ.পরীক্ষা দেবার জন্য বিষয় নির্বাচন করে স্ত্রীকে পত্র লিখেছেন। অজিতকুমার ফিরছেন না জেনে কবি একপ্রকার আশ্বস্ত হয়ে এক পত্রে লেখেন—

'তুমি শীঘ্র আসচো জেনে তোমাকে চিঠি লেখা বন্ধ করে বসেছিলুম। দু'দিন হল তোমার টেলিগ্রাম পেয়ে জানা গেল থেকে যাওয়াই স্থির করেছো। সে খবরটাতে আমরা সবাই খুশি হয়েছি।.....তুমি একটা কথা মন থেকে দূর করে দিয়ো, তুমি আমার কাছে ঋণী একথা মনে রেখো না। আমি তোমাকে ঋণ দেইনে, তোমার মধ্যে যদি কোনো শক্তি থাকে তবে সে শক্তি সফল করে তোলবার যে দায় সে কেবল তোমার নয়—সে আমারও। অতএব ঋণশোধের কথা তুমি মনে ভেবো না এবং আমার কাছে উত্থাপন কোরো না।'[১১]

এছাড়াও ব্যক্তিগত কিছু রচনা প্রসঙ্গ উত্থাপন করে কবি তাঁকে আরও লেখেন যে, তিনি এখন নাটক লেখায় ব্যস্ত আছেন এবং ছাপা হলে তা অজিতকুমারের কাছে পাঠিয়ে দিতেও তিনি যে উদগ্রীব—সেকথা জানাতেও কবি ভুলে যাননি। অর্থাৎ দেখাই যাচ্ছে যে সাহিত্যক্ষেত্রে অজিতকুমারের সুচিন্তিত অভিমতকে কবি বিশেষ গুরুত্ব দিতেন—একথা বলাবাহুল্য।দূরে থেকেও অজিতকুমার যেন কবির কাছে কাছেই থেকেছেন।

এদিকে শারীরিক অসুস্থতার কারণে ২২ অক্টোবর, ১৯১০-এ অক্সফোর্ড থেকে পুনরায় লন্ডনে ফিরে আসেন অজিতকুমার। লন্ডনে অবস্থানরত বিধানচন্দ্র রায়কে দিয়ে নিজের বুক পরীক্ষাও করান। লন্ডনে প্রায় দু'সপ্তাহ থাকার সময়ে শুয়ে শুয়ে রবীন্দ্রনাথের গল্প-কবিতার তর্জমা করে এক বিদূষী মহিলা Mrs. Thomas'কে শোনাতেন। এমনকি 'কাবুলিওয়ালা'র অনুবাদ শুনে তিনি আপ্লুত হন এবং একজন রুশ ভদ্রলোক এই তর্জমা শুনে কেঁদে ভাসিয়েছিলেন। অজিতকুমার পত্রে একথা কবিকে জানিয়েছিলেন। হয়তো দুজনের মধ্যকার সম্পর্কের জটিলতার অবসানে অজিতকুমার নিজেকে দ্বিধাহীনভাবে কবির কাছে সমর্পণ করেছেন—তারও ইঙ্গিত এই পত্রটিতে ছিল—

'.....আপনি আমার গুরু, আমার পিতা, আপনার মধ্যে তো আমি কোথাও বাধা পাইনা।একসময়ে যদি কোনো বাধা কল্পনা ক'রে অপরাধ ক'রে থাকি, তা আমি তো জানি আপনি তখনি মার্জনা করেছেন।.....আমার সম্বন্ধে কেউ কিছু বললেই কি সেটা বড় হবে আর আমি যে সত্যি কি তা ঢেকে যাবে? আমি বিশ্বাস করছি নে যে আপনি আমার থেকে কিছুমাত্র দূরে গেছেন কিম্বা আমার সম্বন্ধে কোনরূপ ব্যথিত হয়ে আছেন। এ সম্বন্ধে আপনার কোনো বলার অপেক্ষাই আমি রাখি না।'[১২]

আমরা মনে করি, কবির সঙ্গে এই বিচ্ছিন্নতা অত্যন্ত জরুরী ছিল—অজিতকুমারের ম্যাঞ্চেস্টার বৃত্তি লাভ করে বিলেতযাত্রা সেইসময়কার কবির সঙ্গে তিক্ততা এড়িয়ে যেতে সাহায্য করেছে—এব্যাপারে আমরাও সহমত।

বিদেশ গিয়ে অবশ্য অজিতকুমার সর্বত্র সমাদর লাভ করেছেন। পেয়েছেন একাধিক বন্ধুও। অজিতকুমার বিলেতে রবীন্দ্রনাথকে আহ্বানও করেছেন। আসলে অজিতকুমার বিলেতের বিদগ্ধ সমাজে কবি ও শান্তিনিকেতনকে প্রথম পরিচিতি দিতে চেয়েছেন। সেই সঙ্গে সঙ্গে কবির রচনার সাথে দার্শনিক ও অধ্যাপক অরফেন এবং সাহিত্যানুরাগী আর.এফ. র‍্যাট্রের যোগাযোগ ঘটিয়েছেন।অধ্যাপক ভাসানি অজিতকুমারের মুখে রবীন্দ্রসংগীতের অনুবাদ শুনে অভিভূত হয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের স্বয়ংকৃত কিছু ইংরেজী তর্জমাও শুনিয়ে সকলকে মুগ্ধ করে দিয়েছেন অজিতকুমার। ইত্যবসরে ১১ নভেম্বর তিনি আবার লন্ডন থেকে অক্সফোর্ড ফিরে প্রবল হতাশায় দেশে ফিরে আসার বন্দোবস্ত করেছেন। কারণ কর্তৃপক্ষ তাঁকে রাখতে চাননি। ৩০ নভেম্বর অক্সফোর্ড থেকে শেষবারের মত বিদায় নিয়ে হ্যামস্টীড-এ প্রমথলাল সেনের কাছে চলে এসেছেন ২০ ডিসেম্বর তারিখে। ২১ ডিসেম্বর ফ্রান্সে গিয়ে ২৩-এ মার্সেল থেকে যাত্রা করে ৬ জানুয়ারী ১৯১১-তে তৎকালীন বোম্বাইয়ে নেমে ৮ তারিখ সন্ধ্যায় শান্তিনিকেতনে পৌঁছান। শান্তিনিকেতনে কয়েকদিনের বিশ্রামের পর কবি তাঁকে আরও কিছুদিন থেকে যেতে বললেও আসন্নপ্রসবা স্ত্রীর জন্য চিন্তাবশতঃ ঢাকায় চলে যান। সেখানে 'পূর্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজ'-এ ৬ মাঘ (১৩১৭ বঙ্গাব্দ)মহর্ষির মৃত্যুবার্ষিকীতে আয়োজিত সভায় মহর্ষি সম্পর্কে বক্তৃতা করেন এবং কবিকে সেকথা পত্রে জানান। ৯ মাঘ উক্ত সমাজে 'পূর্ব ও পশ্চিমের ধর্মসাধনা'' বিষয়ে বক্তৃতা ও পরবর্তীতে রবীন্দ্রনাথের কাব্য ও সংগীত বিষয়ক রচনা পাঠ করেন। জানা যায় ঢাকার বিস্তর স্কুল-কলেজের ছাত্র ও মহিলাগণ আগ্রহের সঙ্গে তাঁর মধুর কণ্ঠের সুচিন্তিত বক্তৃতায় যথেষ্ট আনন্দ উপভোগ করেন।

ইতিমধ্যে তিনি পুনরায় শান্তিনিকেতনে আশ্রমের কাজে নতুন করে যোগ দিয়েছেন—তাঁর প্রথমা কন্যার জন্মের পর (১৩১৭, ৫ ফাল্গুন) কবি স্বয়ং নামকরণ উৎসবে উপাসনা করেন—কন্যার নাম দেন 'অমিতা।' এদিকে ১৩১৮-এর ২৫শে বৈশাখ বিশেষ আড়ম্বরে আশ্রমে কবির পঞ্চাশৎ-জন্মোৎসব উদযাপনের প্রভাতী সভায় অজিতকুমার স্বরচিত 'রবীন্দ্রনাথ' শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করেন। প্রথমে 'প্রবাসী' ও পরে প্রিয়নাথ সেন কর্তৃক ১৯১৩-তে 'রবীন্দ্রনাথ' নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। বলাবাহুল্য এই গ্রন্থই রবীন্দ্রসাহিত্যের প্রথম প্রবেশক[১৩] হিসেবে আজও অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। এই গ্রন্থ সম্পর্কে 'প্রবাসী' পত্রিকা লেখে—

'কবিবর রবীন্দ্রনাথের কর্মজীবন ও কাব্যের ইহা নিপুণ ও বিশদ বিশ্লেষণ।.....লেখক বিশেষ নিপুণতার সহিত রবীন্দ্রনাথের বহু কাব্য ও কবিতা পর্য্যালোচনা করিয়া তাঁহার কাব্যজীবন ও কাব্যের একটি ক্রমবিকাশ নির্দেশ করিয়াছেন। এই কাব্যখানি পাঠ করিলে কবির অনেক কাব্যের অন্তর্গত গূঢ় মর্মকথাটির সহিত পরিচয় সহজ হইবে এবং কবির কাব্যের ভাবৈশ্বর্য; সৌন্দর্য উদ্ঘাটিত বিশ্লেষিত দেখিয়া আনন্দ ও বিস্ময়—দুইই হইবে।' [১৪]

তবে শুধু কবিকে নিয়ে গ্রন্থ রচনাই নয়—২৫ শে বৈশাখে 'রাজা' নাটকে সুদর্শনার ভূমিকায় অভিনয়ে ও সংগীতে খ্যাতি অর্জন করেন। রবীন্দ্রনাথ এ বিষয়ে মীরাদেবীকে পূর্বে এক পত্রে পরিহাস করে লেখেন—

'শুনে হয়ত খুব এক চোট হাসবি—অজিত সুদর্শনা সাজবে। তাকে খুব করে মেজে-ঘষে পরচুলো পরিয়ে ঢেকে-ঢুকে কোনোমতে কাজ চালিয়ে নিতে হবে। অন্ধকার Scene-এ কোনো মুস্কিল নেই—কিন্তু আলোর Scene-এ কিরকম হয় বলা যায় না। কিন্তু উপায় নেই। আর কোনো ছেলে সুদর্শনার অভিনয় করতে পারবে না।'[১৫]

আসলে কবি তাঁর সমস্ত প্রতিভাকে টেনে বের করেছেন, ভালোবেসেছেন--ভরসাও করেছেন। ১৩১৮-এর ৭ই পৌষ রবীন্দ্রনাথের অনুপস্থিতিতে মন্দিরে সকালের উপাসনার ভারও তাঁর উপর পড়ে। তিনি ৮ই পৌষ ছাতিমতলার অনুষ্ঠানে আশ্রমের আদর্শ ও ইতিহাস সম্বন্ধে একটি বিস্তৃত প্রবন্ধ পাঠ করেন—যা পরবর্তীকালে 'বিদ্যালয়' নামে প্রকাশিত হয়।

তবে এরও কিছুদিন আগেই রবীন্দ্রনাথের উৎসাহে ও অনুপ্রেরণায় অজিতকুমার সংকলিত ও সম্পাদিত মহাপুরুষ বাণী সংগ্রহ তিনভাগে 'ভক্তবাণী' নামে ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস থেকে প্রকাশিত হয়। ১৯১১তে রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘ ভূমিকা সহ 'খৃষ্ট' গ্রন্থটিও উক্ত প্রকাশনা থেকে প্রকাশিত হয়। 'সতীশচন্দ্রের রচনাবলী'র ভূমিকা লেখার জন্য অজিতকুমার অনুরোধ করলেও, বিলেত যাত্রার পূর্বে সময় স্বল্পতার কারণে রবীন্দ্রনাথের পক্ষে তা আর সম্ভবপর হয়ে ওঠেনি। কিন্তু ইতিপূর্বেই অজিতকুমার বিলেতে যাপনকালে রবীন্দ্রনাথের কবিতা ও গদ্যের তর্জমা করেন—দেশে ফিরেও আনন্দ কেন্টিশ কুমারস্বামীর সঙ্গে একযোগে অনুবাদের কাজে কবিরও স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন পান। এব্যাপারে 'প্রবাসী'র সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে সেগুলি প্রকাশের জন্য রবীন্দ্রনাথ চিঠিতে উল্লেখ করেন। বিলেতে থাকাকালীন 'মডার্ন রিভিউ' অজিতকুমারকৃত ও কুমারস্বামীর মার্জিত ১১টি কবিতা 'Poems of Rabindranath Tagore'-প্রবন্ধে মুদ্রিত করেন। এমনকি ১৯০১-তে অজিতকুমারকৃত কিছু অনুবাদ একটি ভূমিকাসহ পাঠাতে কবিকে অনুরোধ করেন প্রমথলাল সেন। তাঁর ইচ্ছা যে, সেগুলি রোটেনস্টাইন ও ফকস স্ট্র্যাংওয়েজ প্রভৃতি বন্ধুদের সাহায্যে বিলেতের পত্রিকায় প্রকাশ করা। এব্যাপারে কবি অজিতকুমারকে চিঠিতে বিষয়টি জানিয়ে তাঁর কাছ থেকে কপি করে পাঠিয়ে দিতে বলেছেন। এমনকি দরকার পড়লে তাঁকে ভূমিকা লিখে দেবার পূর্ণ অধিকারও দিয়েছেন। এপ্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, 'সোনারতরী'র ইংরেজী অনুবাদও করেছিলেন অজিতকুমার। এইসময় (২৭ মে, ১৯১২)কবি বিলেতে পাড়ি দেন। অজিতকুমার 'অন্তর ও বাহির' অনুবাদ করে বন্ধু আর.এফ. র‍্যাট্রের কাছে পাঠিয়েছেন। কবি বিলেত থেকে অজিতকুমারকে জানিয়েছেন যে, তাঁর 'সব পেয়েছির দেশ'-এর তর্জমা সেখানে 'Nation' কাগজে বেরিয়েছে এবং 'Literary' প্রশংসিত হয়েছে। অবশ্য অজিতকুমারের নামে অনুবাদটি বের না হলেও অজিতকুমার কবির লেখা অনুবাদ করার ঝোঁকে 'তব রবি কর আসে কর বাড়াইয়া' অনুবাদ করে পাঠিয়েছেন। সেই সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের চিঠিতে বিলেতের পত্র-পত্রিকায় অনুবাদ প্রকাশের আশ্বাস পেয়ে অজিতকুমার সেটাকে এক দুর্লভ সুযোগ মনে করে 'শান্তিনিকেতন' গ্রন্থ থেকে একের পর এক প্রবন্ধের তর্জমার কাজে হাত দিয়েছেন। এই কাজটিকে খুব সৌভাগ্যের মনে করেছেন। তাঁর পূর্বকৃত বিদ্যালয় সম্পর্কে প্রবন্ধটি কবি আমেরিকায় গিয়ে ছাপানোর ব্যবস্থা করবেন জেনে সেটিও পাঠিয়ে দিয়েছেন। এইভাবে ক্রমান্বয়ে কবির 'শান্তিনিকেতন' গ্রন্থ থেকে মোট ন'টি প্রবন্ধের তর্জমা পাঠানোর পর একসময় অজিতকুমার জানতে পারেন যে, রবীন্দ্রনাথ নিজেই গদ্য তর্জমার কাজে হাত দিয়েছেন। তখন থেকেই তিনি এইকাজে বিরত হয়ে কবিকে লেখেন যে—

'আপনি গদ্য লিখতে প্রবৃত্ত হয়েছেন জেনে 'শান্তিনিকেতন' থেকে তর্জমা করায় বিরত হলাম.....এগুলো যখন হয়ে গেছে তখন দেখেশুনে কোন কাজে লাগাতে যদি পারেন তবে খুশি হব।'[১৬]

এদিকে রবীন্দ্রনাথের নির্দেশে ব্রহ্মচর্যাশ্রম সম্পর্কে রচনা ও রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে 'On his life and poetry and his place in our literature'-প্রবন্ধটি শান্তিনিকেতনে অ্যান্ড্রুজকে দিয়ে সংশোধনের পর রোটেনস্টাইনকে পাঠান—কিন্তু তা মুদ্রিত হয়নি। অথচ রবীন্দ্রনাথ বারবার তাঁকে বিলেতে লেখা প্রকাশের বিষয়ে আশ্বস্ত করেছেন। আরও কিছু সময় অপেক্ষা করার কথাও চিঠিতে জানিয়েছেন। অজিতকুমারের 'কবীরের বাণী'র ইংরেজী অনুবাদগুলিও ১৯১৩-এর মাঝামাঝি রবীন্দ্রনাথের ইচ্ছায় তাঁর কাছে পাঠানো হয়। এই অনুবাদকে প্রকাশযোগ্য রূপ দিতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথকে যথেষ্ট পরিশ্রম করতে হলেও কবি প্রথম থেকেই অবশ্য চেয়েছিলেন এটি অজিতকুমারের নামেই প্রকাশ করা হোক। কিন্তু ঘটনাক্রমে ইভলিন আন্ডারহিলের ভূমিকাসহ রবীন্দ্রনাথের সহযোগী হিসেবে তাঁর নামই মুদ্রিত হয়। আখ্যাপত্রে আছে—

'Translated by Rabindranath Tagore/Assisted Evelyn Underhill.'

এক্ষেত্রেও অনুবাদক হিসেবে অজিতকুমারের কপালে জুটেছে কেবলই ধন্যবাদ—

'.....Our most grateful thanks are due to Mr. Ajitkumar Chakravarty for the extremely generous and unselfish manner in which he has placed his work at our disposal.'

(India Society থেকে প্রকাশিত 'One Hundred Poems of Kabir' গ্রন্থের Introduction)

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বারবার চিঠিতে অজিতকুমারের নামে গ্রন্থটি প্রকাশ জন্য Macmillan কে অনুরোধ করেছেন—তিনি চেয়েছিলেন অজিতকুমারের কিছু অর্থ প্রাপ্তি ঘটুক। কিন্তু ব্যবসায়িক স্বার্থে নোবেলপ্রাপক রবীন্দ্রনাথের নামকে তাঁরা ব্যবহার করতে

চেয়েছেন। এককভাবে কিংবা যুগ্মভাবেও অজিতকুমারের নাম না থাকায় কবি যথেষ্ট বিব্রত বোধ করেছেন। অবশ্য সাধারণ মানুষ এ বিষয়ে কৌতূহলী হয়ে অজিতকুমারের বঞ্চনায় রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে নিন্দায় মুখর হয়েছেন। এবং আরও আশ্চর্যের—এইখান থেকেই বোধহয় কবির সঙ্গে অজিতকুমারের সম্পর্কের মধ্যে একটা অন্য মাত্রা যোগ করে—যা পরবর্তীকালে পারস্পরিক বিশ্বাস-অবিশ্বাসের ক্ষেত্রটিকে পুনরায় বড়'ই জটিল করে তোলে।

কিন্তু ৩য় বার বিলেত যাত্রার সময়ে (১৩১৯ বঙ্গাব্দ) রবীন্দ্রনাথ 'তত্ত্ববোধিনী' সম্পাদনার দায়িত্বভারসহ মাসিক পনেরো টাকা সাম্মানিকের ব্যবস্থাও অজিতকুমারের জন্য করে যান। যদিও কবির সম্পাদনা-কালে অজিতকুমারই রচনা-সংগ্রহ ও রচনা নির্বাচনাদির কাজটি দায়িত্বের সঙ্গে পালন করতেন। তবে রবীন্দ্রনাথ বিলেত থেকে ফেরার পর অজিতকুমার সম্পাদনার দায়িত্বভার ছাড়তে চাইলে কবিও আর 'তত্ত্ববোধিনী'র সম্পাদক থাকতে চাইলেন না। একথা জানতে পেরে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর এক পত্রে অজিতকুমারকে আশ্বস্ত করে লেখেন যে—

'.....আমি যতদূর বুঝেছি তুমি এর থেকে বিযুক্ত না হলে রবি একরকম চালাতে সাহস পান। তুমি এ ভার কি নিতান্তই গ্রহণ করতে অনিচ্ছুক? একবার ভাল করে ভেবেচিন্তে আমাকে তোমার কি শেষ সিদ্ধান্ত হয় লিখো। যদি আর্থিক কারণ থাকে তাহলে তার প্রতিবিধানে আমি চেষ্টা করতে পারি। অবিশ্যি মাসিক ১৫ টাকা সম্প্রদেয় পারিতোষিক কিছুই নয়—কত টাকা হলে তোমার ঠিক পোষায় আমাকে জানিয়ো।'[১৭]

অর্থাৎ পরিবারগতভাবে অজিতকুমারের আর্থিক বিষয়টি সমাধানের চেষ্টা হলেও, আর্থিক কারণেই তিনি আশ্রম ত্যাগ করতে বাধ্য হলেন। আশ্রমের সীমিত বেতনের কাজ ছেড়ে নানাভাবে অধিক উপার্জনের চেষ্টা করেছেন। অবশ্য দ্বিপেন্দ্রনাথের উদ্যোগে মহর্ষির একখানি ভাল জীবনী গ্রন্থ অজিতকুমারকে দিয়ে লেখানোর উদ্যোগ নেওয়াতে মাসে ১০০ টাকা একবছর দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। বিদ্যালয়ের কাজ করে এই বই লিখতে বিলম্ব হতে পারে ভেবে তিনি গিরিডি ও কলকাতায় থেকে কাজ শেষ করতে গিয়ে অচিরেই কলকাতার সামাজিক ও সাহিত্যিক জীবনের সঙ্গেও পরিচিতি লাভ করেন। এদিকে আবার আশ্রমের মধ্যে কবির কাছের মানুষ হওয়ার জন্য কর্মীদের মধ্যে অসুস্থ প্রতিযোগিতার থেকে নিজেকে দূরে রাখতে চেয়েও তিনি হয়তো আশ্রম ছেড়েছিলেন বলে কেউ কেউ মনে করেন। তবে আশ্রমিক-বন্ধু এন্ডরুজের ব্যবহারেও অজিতকুমার আঘাত পান ও ব্যথিত হন। এন্ডরুজ এইসময় নানাভাবে রবীন্দ্রনাথ ও অজিতকুমারের সম্পর্কটিকে তিক্ত করে তোলার চেষ্টা করেছেন। স্ত্রী লাবণ্যলেখাকে একথা তিনি জানিয়েছেন পত্রে। আসলে সহজ-সরল অজিতকুমার মানুষকে বিশ্বাস করে ঠকেছেন বারবার—হয়তো এমনও হতে পারে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এত ঘনিষ্ঠতা ও স্নেহ-নিবিড়তা মেনে নিতে পারেননি অনেকেই। কখনও বা লোকের মুখে অজিতকুমার সম্পর্কে কোনো কথা শুনে রবীন্দ্রনাথ ক্রুদ্ধ হয়ে অন্যের কাছে ক্ষোভ প্রকাশ করলে তা অজিতকুমারের কানে পৌঁছালে কবি তা অকপটে স্বীকার করে নিয়ে অজিতকুমারের কাছে নিজের ত্রুটি শুধরে নেবার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছেন। আসলে কবি তাঁকে হয়ত বা আঘাত দিতে চাননি--বরং ব্যথিত হয়েছেন। তাই অকাতরে নিজের দোষটুকুকে অজিতকুমারের কাছে সহজেই স্বীকার করে নিতে দ্বিধা করেননি।

এমতাবস্থায় অজিতকুমার আশ্রম ত্যাগ করলে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে বাধা না দিলেও বেদনা পেয়েছিলেন খুব। কিন্তু কেন জানি না যেকোনো কারণেই হোক অজিতকুমারের মনে দৃঢ় প্রত্যয় জন্মায় যে, বিলেত থেকে ব্যর্থ হয়ে ফেরাতেই তিনি রবীন্দ্রনাথের স্নেহ থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন এবং আশ্রম কর্মীদেরও অবহেলার পাত্র হয়েছেন। তাই তিনি পুনরায় বিলেত গিয়ে সেখানে এম.এ. দেবার পরিকল্পনা করেছেন। এজন্য অবশ্য রবীন্দ্রনাথ ও রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের কাছে সার্টিফিকেট নিয়েছেন—কিন্তু তাঁর বিলেতে আর যাওয়া হয়ে ওঠেনি। বরং তিনি মহর্ষির জীবনী লেখার কাজে নিজেকে নিবিষ্ট করেছেন। এ প্রসঙ্গে স্ত্রীকে লেখেন—

'.....আমাকে এ বছর তোমাকে ছুটি দিতে হবে—আমি যে কাজের ভার নিয়েছি সে কাজ আমার সব সময় নেবে। কোনো চিত্ত বিক্ষেপ ঘটলে বা অন্য কোনো দিকে মন গেলে চলবে না। মনে কর যেন অতি দূর দেশে গিয়েছি—বাস্তবিক এক বৎসর আমার তপস্যার কাল হবে।'[১৮]

১৩২২-এর ৭ই পৌষের পর অজিতকুমার কলকাতা ও গিরিডিতে থেকে একনিষ্ঠ চিত্তে এই জীবনচরিত লিখতে থাকেন। অবশেষে ১৯১৬ তে গ্রন্থ রচনার কাজ তিনি শেষ করেন। এবং এবছরই 'মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর' গ্রন্থটি ইন্ডিয়ান প্রেস,

এলাহাবাদ থেকে প্রকাশিত হয়। 'প্রবাসী' পত্রিকার সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় গ্রন্থটির সমালোচনায় গ্রন্থটিকে 'অতি উৎকৃষ্ট' বলে উল্লেখ করেন। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ১০ অক্টোবর ১৯১৬ তে লস অ্যাঞ্জেলস থেকে চিঠিতে অজিতকুমারকে লেখেন—

'.....তোমার বই খুব আনন্দের সঙ্গে পড়েছি। এখানকার গোলমাল টানাহেঁচড়ার মাঝখানে তোমার এই বই আমাকে গভীর শান্তি এবং শক্তি দান করেছে। আমার বিশ্বাস বর্তমানকালে তোমার এই বইটিতে দেশের লোকের উপকার হবে।'[১৯]

অর্থাৎ মহর্ষির জীবনচরিত নিঃসন্দেহে রবীন্দ্রনাথের প্রত্যাশা পূর্ণ করেছে। এমনকি জীবনচরিত রচনাপর্বেই 'শান্তিনিকেতন' ও 'বিলাতের পত্র' গ্রন্থ দু'টির সম্পাদনার ভারও অজিতকুমারকে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তাছাড়াও রবীন্দ্রবিরোধী সমালোচনার প্রতিবাদে লেখনী ধারণ করেছেন অজিতকুমার। সুরেশচন্দ্র সমাজপতি সম্পাদিত 'সাহিত্য' পত্রিকা এবং চিত্তরঞ্জন দাশ সম্পাদিত 'নারায়ণ' পত্রিকার লেখকগোষ্ঠী রবীন্দ্ররচনার বিরূপ সমালোচনায় ছিলেন মুখর। কখনও পাল্টা আক্রমণে রবীন্দ্রবিরোধী সমালোচনার সমস্ত যুক্তিকে খণ্ডন করে অজিতকুমার প্রতিবাদী সমালোচকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন। অত্যন্ত ক্ষুরধার ভাষায় সাময়িকপত্রে সমালোচনার জবাব দিতে গিয়ে অজিতকুমারকে অনেক শ্লেষাত্মক আক্রমণ সহ্য করতে হয়েছে। তবু তিনি আশ্রম ছেড়ে গেলেও গুরুদেবের সম্মান রক্ষায় ছিলেন সদা নির্ভীক।

এইসময় একদিকে আর্থিক সংকট আর অন্যদিকে মেধাবী মধ্যম ভ্রাতা সুজিতকুমার যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হলে অজিতকুমার বগড়িবাড়ির জমিদারের ছেলেমেয়ের গার্জেন-টিউটার নিযুক্ত হয়ে আসামে যান। কিন্তু সেখানেও বেশিদিন থিতু হতে পারেননি তিনি। যদিও স্ত্রীকে পত্রে লিখেছেন যে, সুবিধে মত তাঁদেরও তিনি বগড়িবাড়িতে নিয়ে যেতে চান। কিন্তু তিনি শেষ পর্যন্ত বগড়িবাড়ি ত্যাগ করে অন্যত্র কোনো কাজের কথা ভেবেছেন। এদিকে অসুস্থ ভ্রাতা সুজিতকুমারের মৃত্যু ঘটলে (১৯ ভাদ্র, ১৩২৩) তিনি কলকাতায় ফিরে আসেন এবং পারিবারিক বন্ধু ডা. দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্রের আশ্রয়ে (মেয়ো হাসপাতালের কোয়ার্টারে) উঠলেও আর্থিক চিন্তা তাঁর মাথা থেকে সরে যায়নি। বি.এ.পাঠরত কনিষ্ঠভ্রাতা সুশীলকুমারের সমস্ত খরচ, নিজের খরচ ও ঢাকায় স্ত্রী লাবণ্যদেবীর খরচ চালাবার জন্য কখনও প্রাইভেট টিউশন-এর খোঁজ করেছেন, কখনও বা Book Note বা বই লেখার কথাও ভেবেছেন। কখনও ছেড়ে আসা জোড়াসাঁকোয় গিয়েছেন কাজের সন্ধানে। কিন্তু সেখানে 'বিচিত্রা ভবন'-এ রবীন্দ্রনাথের প্রতিষ্ঠিত পারিবারিক স্কুলে পড়ানোর কথা হলেও স্কুলটি স্কুলের চেহারা না পাওয়ায় অজিতকুমারের আর সেই কাজটি পাওয়া হয়ে ওঠেনি। এমতাবস্থায় মা সুশীলাদেবীর অপারেশনের জন্য অর্থ সংগ্রহের নিরুপায় হয়ে তিনি স্ত্রীর কাছেই পত্র লিখেছেন। স্থায়ী রোজগার না থাকায় অর্থাভাবে সংসারের আসবাবপত্র পর্যন্ত বিক্রি করতে বাধ্য হয়েছেন। ভবঘুরের মত কখন মেসে, কখনও বা ডা. দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্রের আশ্রয়ে থেকেছেন। শান্তিনিকেতনে আশ্রমের কাজে পুনরায় বহাল করার অনুরোধে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে আশ্বস্ত করে জানান যে—

'শান্তিনিকেতনে তোমার আসা সম্বন্ধে এখনো কিছুই স্থির করিনি। কেবলমাত্র অল্পকালের জন্যে তোমাকে তোমার উপস্থিত ব্যবস্থার থেকে নাড়া দিতে ইচ্ছা করিনে। এখানে স্থায়ী বন্দোবস্তের জন্যে একটা কোনও উপায় বোধহয় শীঘ্র করা যেতে পারে।'[২০]

অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ একটা কোনো স্থায়ী কাজ দিয়ে অজিতকুমারকে আশ্রমে ফিরিয়ে আনার কথা ভেবেছিলেন—কারণ ততদিনে ব্রহ্মবিদ্যালয় বিশ্বভারতীতে রূপান্তরিত হলেও আত্মত্যাগী, আদর্শবাদী ও নিঃস্বার্থপর কর্মীকে রবীন্দ্রনাথ বিস্মৃত হননি।

তবে জীবনসংগ্রামে ক্ষতবিক্ষত অজিতকুমার আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের নির্দেশে রামমোহন রায়ের জীবনীগ্রন্থ ইংরেজীতে লেখায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। আচার্য শীলের সঙ্গে অজিতকুমারের শুভ যোগাযোগ সম্পর্কে তখনও রবীন্দ্রনাথ এক পত্রে তাঁকে উৎসাহ দিয়ে লেখেন—

'এতদিনে তুমি হয়ত তোমার শক্তিকে ঠিকমত চালনা করবার উপযুক্ত পন্থাটি পেয়েছ এবং এখন থেকে আর কোনো বাধা তোমাকে প্রতিহত করতে পারবে না। এই উপলক্ষ্যে ব্রজেন্দ্রবাবুর সঙ্গে তোমার যে যোগ হয়েছে তাতেও আমি খুব আনন্দিত আছি। ব্রজেন্দ্রবাবুর মধ্যে যে সঞ্চয় আছে তাকে নানা দিক দিয়ে মুক্তি দেবার সময় উপস্থিত হয়েছে—ইতিপূর্বে এ সম্বন্ধে যাঁরা চেষ্টা করেছেন, তাঁদের মধ্যে দিয়ে ব্রজেন্দ্রবাবুর বাণী বিশুদ্ধ হয়ে প্রকাশ পায়নি—তাঁরা নিজের নিজের প্রয়োজনে কথাগুলিকে ব্যবহার করেছেন। আশা করি তুমি ভগীরথের মত মন্দাকিনীর নিরুদ্ধ ধারাকে পূর্ণ স্রোতে মর্তে নামিয়ে আনতে পারবে।'[২১]

বলাবাহুল্য কলকাতায় রামমোহন রায়ের জীবনী রচনাকালেই অজিতকুমার ইনফ্লুয়েঞ্জা জ্বরে আক্রান্ত হন। অসুস্থতার কারণেই রবীন্দ্রনাথের আমন্ত্রণে তিনি সেবছরে ৭ই পৌষে সভাপতিত্ব করতে শান্তিনিকেতনে যেতে পারেননি। নেপালচন্দ্র রায় ও সুধাকান্ত রায়চৌধুরীর কাছে অত্যন্ত স্নেহভাজন ও পুত্রতুল্য অজিতকুমারের অসুস্থতার খবর জানতে পেরে রবীন্দ্রনাথ উদ্বিগ্ন হয়েছেন। প্রতিমুহূর্তে খবর নিয়েছেন। তবু কী একটা আতঙ্ক ও আশঙ্কা যেন কবিকে গ্রাস করেছিল। কেননা ক'দিন আগেই এই রোগের কারণে ঘটে যাওয়া পারিবারিক মৃত্যু ও অসুস্থতা (কৃতীন্দ্রনাথের স্ত্রী সুকেশী দেবীর মৃত্যু এবং প্রতিমা দেবী ও হেমলতা দেবীর গুরুতর অসুস্থতা) তিনি তখনও বিস্মৃত হননি। প্রবল মানসিক অস্থিরতায় ২৯/১২/১৯১৮ তারিখে দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্রকে চিঠিতে অজিতকুমারের অসুস্থতার খবর দিয়ে লেখেন—

'অজিতের অবস্থার কথা শুনে মন বড় উদ্বিগ্ন হল। বুঝতে পারছি কোনও আশা নেই এবং এতক্ষণে হয়ত জীবন অবসান হয়ে গেছে। অল্প বয়স থেকে ও আমার খুব কাছে এসেছিল--ও যদি চলে যায় ত একটা ফাঁক রেখে যাবে।'[২২]

কবির আশঙ্কাই সত্য প্রমাণিত করে ২৯ ডিসেম্বর ভোর চারটের সময় অজিতকুমারের জীবনাবসান ঘটে গড়পার রোডের বাসাবাড়িতে—পাশে তখন বন্ধু সুকুমার রায় ও তাঁর পত্নী সুপ্রভা।

কবি গভীর দুঃখে কাতর হয়ে পড়লেন--অজিতকুমারের মৃত্যুতে তাঁর অন্তরে তৈরী হল গভীর শূন্যস্থান। আসলে তরুণ বয়েসে কবির কাছে এসেছিলেন অজিতকুমার। হৃদয়ের প্রবল অনুরাগ ও শ্রদ্ধায় অজিতকুমারের সমস্ত সত্তা কবির সৃষ্টির সঙ্গে একাত্ম হয়েছিল অচিরেই—তাঁর যৌবনের শ্রেষ্ঠ দিনগুলি উৎসর্গীকৃত ছিল কবির প্রতি। হয়তো অজিতকুমারের আর্থিক অসংগতি ও প্রয়োজনীয়তার মত বাহ্যিক চাওয়া-পাওয়ায় দু'জনের মধ্যে কখনও বা এই সুন্দর সম্পর্কে চিড় ধরে ছিল ঠিকই—তবু পারস্পরিক স্নেহ ও শ্রদ্ধা যেমন অটুট ছিল, ঠিক তেমনই অন্তরে অন্তরে বাঁধনটি ছিল নিবিড় ও দৃঢ়। সেখানে ঘাটতি ছিল না, ছিল না বিন্দুমাত্র প্রশ্নচিহ্ন। অবশ্য সাময়িক অজিতকুমারের দূরে চলে যাওয়াটা তাঁরই স্বাতন্ত্র্যবিকাশের সহায়ক হয়েছিল—একথাও বলাবাহুল্য। তাই সম্পূর্ণ নির্ভীকভাবে প্রবল প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে কিংবা প্রচলিত মতের বিরুদ্ধে নিজের মত প্রকাশে অজিতকুমার ছিলেন দ্বিধাহীন। কবি অজিতকুমারের এই বিশেষ 'গুণ' কে স্বীকার করে নিয়েছিলেন অকুণ্ঠ চিত্তে। লাবণ্যলেখাকে তিনি লিখেছেন—

'.....আমার জীবন এই পৃথিবীতে যাদের মধ্যে ব্যাপ্ত হতে পেরেছে তাদের মধ্যে অজিত ছিল অত্যন্ত নিকটবর্তী। এইজন্য অজিতের অভাব আমার পক্ষে অত্যন্ত গুরুতর।' [২৩]

অর্থাৎ শুধু বাহ্যিক সম্পর্ক নয়—কবি তাঁকে অন্তরে অন্তরে নিজের করে নিয়েছিলেন একেবারে। বারবার চিঠিপত্রে উঠে এসেছে অজিতের প্রসঙ্গ। তাঁদের মধ্যে মতান্তর হলেও মনান্তর হয়নি কখনও। তাই অজিতের মৃত্যুর পরেও এই সাবলীল সম্পর্কের স্মৃতিটি কবির কাছে ছিল অমলিন।

তথ্যসূত্র:

১. প্রশান্তকুমার পাল/রবিজীবনী (৫ম খন্ড)/আনন্দ(৩য় মুদ্রণ)/১৪১৪/পৃ-১৮৫।

২. লাবণ্যলেখা চক্রবর্তী/দুই বন্ধু/বিশ্বভারতী পত্রিকা/মাঘ-চৈত্র/১৩৫৮/পৃ-২০৫।

৩. প্রবাসী/ভাদ্র/১৩৩৫/প্রি-৬৮১-৬৮২।

৪. ১৯ ফাল্গুন, ১৩১৫ তে লিখিত পত্র।

৫. ১২ বৈশাখ, ১৩১৫ তে লিখিত পত্র।

৬. দেশ/৬ অগ্রহায়ণ, ১৩৯৩।

৭. দেশ/সাহিত্য/১৩৮৮/পৃ-১৫-১৬।

৮. রুদ্রপ্রসাদ চক্রবর্তীর লেখা 'অজিতকুমার চক্রবর্তী জীবনালেখ্য' গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত/বিশ্বভারতী/২০০১/পৃ-৪৭-৪৮।

৯. ৮ সেপ্টেম্বর, ১৯১০ তারিখে মাদ্রাজ থেকে লিখিত পত্র।

১০. ১৭ আশ্বিন ১৩১৭ তারিখে লিখিত পত্র।

১১. ১৬ নভেম্বর, ১৯১০ তারিখে লিখিত পত্র।

১২. ৪ নভেম্বর, ১৯১০ তারিখে লিখিত পত্র।

১৩. রবীন্দ্রজীবনী(২য় খন্ড)/প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়/বিশ্বভারতী/১৪২০/পৃ-৩১৭।

১৪. রুদ্রপ্রসাদ চক্রবর্তীর লেখা 'অজিতকুমার চক্রবর্তী জীবনালেখ্য' গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত/পূর্বোক্ত/পৃ-৬৮।

১৫. চিঠিপত্র/৪র্থ খন্ড/১৩৫০/১৭ সংখ্যক পত্র।

১৬. ১ জানুয়ারী, ১৯১৩ তে লিখিত পত্র।

১৭. ২৬ নভেম্বর, ১৯১৩ তারিখে লিখিত পত্র।

১৮. ২ বৈশাখ, ১৩২১ তারিখে লিখিত পত্র।

১৯. রুদ্রপ্রসাদ চক্রবর্তীর লেখা 'অজিতকুমার চক্রবর্তী জীবনালেখ্য' গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত/পূর্বোক্ত।পৃ-১২৩।

২০. ১১ কার্তিক, ১৩৮০ তারিখে লিখিত পত্র।

২১. দেশ, সাহিত্য, ১৩৮৮, পৃ-৩১।

২২. তদেব/পৃ-১০।

২৩. ১৪ বৈশাখ, ১৩২৬তারিখে লাবণ্যলেখাকে লেখা পত্র।

Citation: **Jana. M.,** (2026) "অজিতকুমার ও রবীন্দ্রনাথ : একটি সম্পর্কের বৃত্ত", *Bharati International Journal of Multidisciplinary Research & Development (BIJMRD)*, Vol-4, Issue-10, October-2026.